বর্তমান শিক্ষা সংস্কারের ঢেউ – আমার কয়েকটি কথা

❑ অনিল কুমার সোম
কামাখ্যা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক

কেন্দ্রে বর্তমান মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীকপিল সিব্বাল ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্কারের জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছেন। দশম শ্রেণীর শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা তুলে দেওয়া, সর্ব ভারতীয় সাধারণ পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, বিশ্বের বিভিন্ন প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারতে শাখা খোলার অনুমতি দেওয়া ইত্যাদি। পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় ধরে বিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে অতপ্রোত ভাবে জড়িত থাকায় মাঝে মাঝেই বিভিন্ন কথা মনে ভেসে ওঠে। চিন্তা হয়, এই সব হঠাৎ সংস্কার না আবার পশ্চিম বঙ্গের জ্যোতি বসুর শাসন কালে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরাজী শিক্ষার আরম্ভ করার মতোই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। অথচ মাতৃ ভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করার কথাতো জ্যোতি বসু বা তাঁর সহকর্মীরা শুরু করেন নি। বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে কবি গুরু রবীন্দ্র নাথ, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্র নাথ বসু সহ বঙ্গের বহু শিক্ষাবিদ মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা বলেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতকে সামনে রেখেই ইংরেজী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব কিছুটা কমাতে চেয়ে ছিলেন উপরোক্ষ রাজনৈতিক নেতারা। কিন্তু যথাযথ চিন্তা ভাবনা না করার ফলে পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েক দশক পিছিয়ে গেল এবং তার জের এখনো চলছে।

দশম শ্রেণীর শেষে বিদ্যালয় শিক্ষান্ত পরীক্ষা যদি তুলে দেওয়া হয় তাহলে তার ফলাফল কি হতে পারে তা গভীর চিন্তার প্রয়োজন আছে। আর এই চিন্তায় শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত সর্বশ্রেণীর মানুষের মতামত জানা উচিত ছিল ; কিন্তু তা কতদূর হয়েছে সে বিষয়ে যথেষ্ঠ সন্দেহের কারণ আছে।

বিদ্যালয় শিক্ষান্ত পরীক্ষা তুলে দিয়ে তার বদলে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের (Continuous Comprehensive evaluation) কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু তার জন্য কি বিদ্যালয় শিক্ষান্ত পরীক্ষা তুলে দেওয়ার খুব প্রয়োজন আছে? বিদ্যালয় শিক্ষান্ত পরীক্ষা তুলে দেওয়ার পক্ষে যুক্তি হলো ছাত্রদের উপর থেকে পুস্তকের বোঝা কমানো। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের পদ্ধতিতে কি তা হবে? ভেবে দেখা উচিত। এই পদ্ধতিতে কার্য্যকর করার জন্য এখন পর্য্যন্ত যাকে বলা হচ্ছে বছরের ছয়টি Unit Test জাতীয় পরীক্ষা হবে। তার চারটি হবে ক্যুইজ, প্রজেক্ট ওয়ার্ক ইত্যাদির মাধ্যমে এবং দুটি হবে লিখিত – এখন যে ভাবে চলছে। এই পদ্ধতিতে হয়তো অধ্যয়নের গভীরতা আসবে কিন্তু বোঝা কমার যুক্তি আদৌ গ্রহণ যোগ্য নয়। বিদ্যালয় শিক্ষান্ত পরীক্ষার শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের একের পর এক পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। মেডিকেল, ইংঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদির জন্য পরীক্ষা থাকবে। সিব্বাল সাহেব এই গুলি তুলে দেওয়ার কথা এখনো বলেন নি। অথচ বিদ্যালয় শিক্ষান্ত পরীক্ষার মধ্যদিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রথম রাজ্যিক বা জাতীয় ভিত্তিতে পরীক্ষার সঙ্গে পরিচিত হয়। জীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে প্রতিটি ক্ষেত্রে গভীর ভাবে অভ্যাস করতে হয়। এমন কি খেলার ক্ষেত্রেও সাফল্য পেতে গেলে নিষ্ঠা এবং অভ্যাস দরকার। অথচ বর্তমান নীতি গৃহীত হলে উচ্চ মাধ্যমিকই হবে প্রথম সাধারণ পরীক্ষা। তার আগে এই জাতীয় পরীক্ষার কোন অভ্যাস ছাত্র ছাত্রীদের করার সুযোগ থাকবে না।

সর্ব ভারতীয় সাধারণ পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করা সব বিষয়ে সম্ভব নয়। বিজ্ঞান, এবং অংক বিষয়ে সাধারণ

পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা সম্ভব এবং করা উচিত । ভাষার পাঠ্যক্রম বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন হতে বাধ্য। অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোলের পাঠ্যক্রম সারা ভারতে এক করতে হলে, আঞ্চলিক অর্থনীতি, ইতিহাস এবং ভৌগলিক বিষয় সমূহ বাদ দিতে হবে। তা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। কাজেই এক্ষেত্রে এগুনোর আগে বিশেষ ভাবে চিন্তা ভাবনা করা দরকার।

ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করার কথা ভাবা হচ্ছে, সে বিষয়েও বিশেষ চিন্তা ভাবনা দরকার আছে। প্রকৃত শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের অকারণে শাস্তি দিয়ে আনন্দ পায় না। এ কথা মনে রাখা দরকার। অবশ্য একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে কিছু অযোগ্য শিক্ষকের জন্য কিছু কিছু অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটেছে। হয়তো ভবিষ্যতেও ঘটবে। কাজেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে এদিকে বিশেষ ভাবে নজর রাখা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার যে স্কুল পর্য্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা ভাবনা এবং মানসিক পরিণতির মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে। স্কুল পর্য্যয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর মনে পড়াশুনোর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতার সৃষ্টি হয় না। ফলে বহু সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি অংশ পড়াশুনোর প্রতি যে মনোযোগ দেওয়া দরকার, তা দেয় না। এই শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু ভয় বা ভীতি প্রদর্শন বা জোর করার প্রয়োজন হয়। না হলে এই সব ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনোর প্রতি তেমন মনোযোগ দেয় না। এটা করতে গিয়ে শিক্ষকরা অনেক সময় আতিশয্যের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। এছাড়াও কখনো কখনো কিছু দুষ্ট ছাত্র-ছাত্রী অতিরিক্ত কড়া শিক্ষককে মিথ্যা অভিযোগ অভিযুক্ত করে তাও অস্বীকার করা যায় না। অথচ বিদ্যালয় স্তরে, সেখানে কিশোর বয়সে ছাত্র-ছাত্রীরা দলবদ্ধ ভাবে থাকে, যদি কিছুটা কঠোরতার সঙ্গে শৃঙ্খলা বজায় রাখা না যায় তা হলে মহর্ষি বিদ্যাপীঠ (শিলপুখুরী) এর মতো ঘটনা প্রায়ই ঘটবে এবং পত্র-পত্রিকায় বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলাহীনতার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদেরই দায়ী করা হবে। কাজেই আইন করে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের হাত-পা বাঁধার আগেই যথাযথ চিন্তা ভাবনা অবশ্যই করতে হবে।

আর উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সিব্বাল সাহেব যে বিল আনছেন তা উচ্চ শিক্ষার পঠন-পাঠন ও গবেষণাকে একটি মাত্র নিয়ামক সংস্থার আওতায় আনবে। এই সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, আই. আই. টি., এবং আই. আই. এম. সহ দেশের সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করবে। আর এই নিয়ামক সংস্থার শীর্ষে থাকবেন একজন চেয়ারম্যান এবং তিন জন পূর্ণ সময়ের সদস্য। অর্থাৎ চার জন অসীম ক্ষমতাশালী মানুষ ভারতবর্ষের সমস্থ উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এরা রাষ্ট্রপতির দ্বারা পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন। স্বয়ং শাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আদর্শের অপমৃত্যু ঘটবে এই শিক্ষানীতির ফলে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, যারা এদেশের শাখা খোলার জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছে তারা এই এক কেন্দ্রীক নিয়ন্ত্রণের আওতায় আসতে সম্মত হবেন কিনা জানি না।

ভারতের দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এ দেশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তার উপর বার বার আঘাত আসছে। ইন্দিরা গান্ধীর সেই অন্ধকার যুগকে ভারতের মানুষ ব্যর্থ করেছে। কিন্তু তারপর থেকে ভারতে পরিবারতন্ত্র কেন্দ্রীয় শাসক শ্রেণীকে ছাড়িয়ে রাজ্যে রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অতি সঙ্গোপনে শিক্ষার মতো মৌলিক ক্ষেত্রগুলিতেও কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা প্রবর্তনে জন্য শাসক গোষ্ঠী সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতে গণতান্ত্রিক আদর্শে সমাধি ঘটতে বেশিদিন আর বাকী আছে বলে মনে হয় না।